এদেরকে মোকাবেলা করতেই হবে

নিরাপত্তা | ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

নিরাপত্তা বিশ্লেষক
অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনসমাগমস্থলে বোমা বা গ্রেনেড হামলা বা অন্যান্য নাশকতা যদিও বিরল নয়; শুক্রবার মধ্যরাতে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতি গ্রহণকালে পুরান ঢাকার হোসেনী দালানে বোমা হামলা আমাদের খানিকটা বিস্মিত না করে পারে না। ধর্মীয় সম্প্রীতির বাংলাদেশেও ধর্মীয় বিদ্বেষ ও দাঙ্গা কিংবা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কখনও কখনও ঘটেছে। কিন্তু হোসেনী দালানে গ্রেনেড হামলার এই ঘটনা এক অর্থে শত শত বছরের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব নেতিবাচক ঘটনা।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাধিক্য মুসলমান, বলা চলে প্রায় সবাই আমরা সুন্নি মতাদর্শ অনুসরণ করে থাকি; কিন্তু শিয়াদের দিক থেকে ভিন্নভাবে পালিত মহররমের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষ করে তাজিয়া শোভাযাত্রা পালনে কখনও কোনো ঝামেলা দেখা যায়নি। শত শত বছর ধরেই আনাচে-কানাচে, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সর্বস্তরের মুসলমানের অংশগ্রহণে তা পালিত হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে কখনও শিয়া-সুন্নি বাছবিচার বা বিভেদ সৃষ্টি হয়নি।

এটা সত্য যে, ঊনবিংশ শতকের ফরায়েজি আন্দোলনের পর থেকে গোঁড়া সুন্নি আলেম-ওলামাগণ মহররমের তাজিয়া শোভাযাত্রা অথবা মাতম বা কালো কাপড় পরিধান– ইত্যাদিকে 'বেদাত' হিসেবে আখ্যায়িত করতেন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদানের বিপক্ষে অভিমত পোষণ ও প্রকাশ করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব খুব একটা ছিল না এবং প্রতিবছর মহররম বরং 'শোকের উৎসব' হিসেবেই পালিত হতো। একই সঙ্গে মহররমের অনুষ্ঠান, বিশেষত তাজিয়ার অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে মেলা আয়োজনসহ কিছু বাণিজ্যিক তৎপরতাও চোখে পড়ে। তাজিয়া বা মাতম ছাড়াও আমরা দেখি, শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান মহররমের দিন রোজা রাখেন এবং গরিব ও ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে শিরনি বা মিষ্টান্ন বিতরণ করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় এই দিন জঙ্গনামা পুঁথি পাঠের আসরও বসানো হয়।

ঢাকায় মহররমের অনুষ্ঠানাদি বিশেষ মাত্রা পেয়ে আসছে। এর একটি কারণ হচ্ছে ঢাকার নবাব পরিবার ছিল শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী। দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় তাই এখানে তাজিয়া শোভাযাত্রা অনেক ধুমধাম ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়ে আসছে। নবাবদের জৌলুস হারিয়ে গেলেও ঢাকায় মহররমের জৌলুস বহালই রয়েছে। আগেই যেমনটি বলেছি, শুধু শিয়া মতাদর্শীরা নন, সুন্নিরাও ব্যাপক মাত্রায় এসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিশেষ করে পুরান ঢাকার জনগোষ্ঠী। মনে রাখতে হবে, ধর্মের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য সবসময়ই ছিল; কিন্তু শিয়াদের কোনো অনুষ্ঠানে হামলা করতে হবে বা শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করতে হবে– এ ধরনের চিন্তাভাবনা কখনও আমাদের দেশে ছিল না।

আন্তর্জাতিকভাবে যদি দেখি, গত কয়েক যুগ ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত যেখানে শিয়ারা সংখ্যালঘু এবং আমাদের উপমহাদেশের পাকিস্তানের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ক্রমেই শিয়া-সুন্নি বিভেদ একটা উৎকট রূপ পরিগ্রহ করছে। শিয়ারা কোনো কোনো দেশে যখন ক্রমেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, তখন তারা নানা ধরনের সামাজিক নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে তালেবান, সিপাহি সাহাবা, লস্করে জঙ্গভি প্রভৃতি উগ্রবাদী ও জঙ্গিগোষ্ঠী শিয়াদের বারবার নিশানা করে হামলা চালিয়ে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটাচ্ছে। এর পেছনে মতাদর্শিক মদদ জোগাচ্ছে ওহাবি মতবাদে বিশ্বাসী একদল ওলেমা। অর্থনৈতিক মদদ দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশ। ওহাবি আলেমরা প্রকাশ্যই ফতোয়া দিয়ে বলছেন যে শিয়ারা ধর্মভ্রষ্ট এবং তাদের হত্যাই করা উচিত। এর ফলে আমরা দেখছি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে বিভিন্ন শিয়া ধর্মীয় স্থাপনা ও জমায়েতে বোমা ও গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনা বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও সিরিয়ায় অতিসম্প্রতি উদ্ভূত ইসলামিক স্টেট বা আইএস জঙ্গিদের হাতে শত শত শিয়া জনগোষ্ঠী নিহত হচ্ছেন।

শিয়া-সুন্নি বিরোধের এই 'আন্তর্জাতিক' ঢেউ বাংলাদেশে এসে আছড়ে পড়া বিচিত্র নয়। এভাবে জনসমাবেশে বোমা বা গ্রেনেড হামলার আরও নানা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সম্ভবত দেশের ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও শিয়া ও সুন্নি বিভেদকে 'কাজে লাগানোর পাঁয়তারা' শুরু হলো।

> যে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে সবাইকে একযোগে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করতে হবে। বিশেষ করে সংখ্যাগুরু মুসলিম সমাজকে মনে রাখতে হবে, এক সময় অমুসলিমদের উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে; এখন হচ্ছে মুসলমানদেরই একটি সংখ্যালঘু অংশের ওপর। এরপর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিভেদ আবিষ্কার করে একই ধরনের হামলা হতে পারে

আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী অমুসলিম উপাসনালয়গুলোতে হামলা চালাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার কথা বলা যায়। এ বছর দুর্গাপূজা উৎসবের সময় দেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে প্রতিমা ভাঙার ঘটনাকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যেতে পারে। হোসেনী দালানের জনসমাগমে হামলাও আমার কাছে একই ধারাবাহিকতা মনে হয়।

আমরা দেখছি, বাংলাদেশে ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ ক্রমে সহিংস হয়ে উঠছে এমন সময়ে, যখন আমরা আর্থসামাজিক দিক থেকে দৃশ্যমান অগ্রগতি লাভ করছি এবং যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুল প্রশংসিত। একই সঙ্গে বলতে হবে, গত এক দশক ধরে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর প্রতি সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর মনোভাবের কথাও। এভাবে বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে যাচ্ছে, তখনই যেন এভাবে ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ উসকে দিয়ে দেশের অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে। হোসেনী দালানে গ্রেনেড হামলার ঘটনার মতো সহিংসতা কিছু রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন এ লক্ষ্যেই চালাতে পারে।

অতিসম্প্রতি ঢাকা ও রংপুরে দু'জন বিদেশি নাগরিক হত্যা, দেশের বিভিন্ন মাজার, পীর-ফকিরদের খানকায় হামলা, রক্তপাত, হত্যার লক্ষ্যও হতে পারে অভিন্ন।

আমাদের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ও হামলা অব্যাহত থাকায় স্বভাবতই জনমনে হতাশা ও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। জনসাধারণকে ভরসা জোগাতে হলে এসব হামলার নেপথ্য খলনায়কদের অবশ্যই শনাক্ত ও বিচারের আওতায় আনতে হবে। তা না হলে উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো আরও হামলার দুঃসাহস পাবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী চরম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বস্তুত সরকার ও জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব অপশক্তির মোকাবেলা করতে হবে। নতুন ধরনের এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর কর্মক্ষমতা বাড়াতেই হবে। ইতিমধ্যে যেসব জঙ্গি আটক হয়েছে, তাদের দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে সমাজে যাতে উগ্র মতবাদের বিস্তার লাভ করতে না পারে, সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও ধর্ম মন্ত্রণালয়কে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। জনসাধারণকেও মনে রাখতে হবে, যে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে সবাইকে একযোগে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করতে হবে। বিশেষ করে সংখ্যাগুরু মুসলিম সমাজকে মনে রাখতে হবে, এক সময় অমুসলিমদের উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে; এখন হচ্ছে মুসলমানদেরই একটি সংখ্যালঘু অংশের ওপর। এরপর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিভেদ আবিষ্কার করে একই ধরনের হামলা হতে পারে। বস্তুত জঙ্গি ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর জিঘাংসার কোনো শেষ নেই। তারা কারও বন্ধু নয়। তারা বিশেষ কোনো ধর্ম নয়, বরং মানবতার শত্রু।

দুর্ভাগ্যজনক হলো, একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন, সেটা এখনও আমাদের দেশে অনেকাংশে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দেওয়া হয়। এই সুযোগ ব্যবহার করে জঙ্গিরা তাদের প্রভাববলয় বিস্তৃত করে থাকে। তখন দুধ-কলা দিয়ে পোষা কালসাপ মদদদাতাদেরই ছোবল মারতে পারে। এমন উদাহরণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই দেখা গেছে। ফলে আমি মনে করি, জঙ্গিবাদীদের মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক আদর্শ ও মতাদর্শ নির্বিশেষ সব রাজনৈতিক দল, দেশপ্রেমিক জনগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।